জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১০, নং-১, জানুয়ারি-জুন ২০২০

বাঙালির জাতীয় নাট্যাঙ্গিক : সেলিম আল দীন

মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান*

Abstract

Selim Al Deen is a renowned Bangladeshi dramatist who searched for a national form of drama which has a link with old narrative drama originated almost a thousand years ago. This narrative style of drama was highly developed in the Middle Age (Bangla literary age division). He always believed that Bangla drama had not started from Stefanovic Lebedev's initiative just two hundred years ago. Bangla drama has a long tradition which developed in mass people. Though Selim wrote dialogue-based drama in his early career, he always thought of a National Form of Bangla drama. He tried to find out an outline and structure of the thousand-year old history of Bangla drama and wrote *Modhya-juger Bangla Natya* in 1996. Selim Al Deen was the pioneer of "dualistic dualism" theory of art which breaks the boundary of art forms such as novels, dramas and poetry. Through dualistic dualism he wrote many dramas which he called 'Kathyanatya'. Kathyanatya is actually a narrative form of presenting drama. His famous dramas Chaka, Joiboti Konnyar Mon, Hargaj etc. have been written in the narrative form which he called Kathyanatya. As Bangla drama has a golden tradition, it may reveal the history of the past. For this, Selim Al Deen struggled for a National Form of Drama throughout his life.

ভূমিকা

বাংলা নাটকের একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। সহস্র বছরের পথ চলায় বাংলা নাটক বর্তমান যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাকে কোনোভাবেই আর ঐতিহ্যের সাথে মেলানো যায় না। এর মূল কারণ, বাংলা নাটকের সুদীর্ঘ ইতিহাস অস্বীকার করে এর উৎসকে আটকে ফেলা হয়েছে লেবেদেফ কর্তৃক নাটক মঞ্চায়নের ঘটনার সাথে। নাট্যকার সেলিম আল দীন বাংলা নাটকের মূল অনুসন্ধান করে একটি জাতীয় নাট্যাঙ্গিক নির্মাণে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি মনে করেন, বর্তমান সময়ের নাট্যচর্চার প্রেক্ষাপটে বাংলা নাটকের জন্য একটি জাতীয় আঙ্গিক নির্মাণ খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। জাতীয় নাট্যাঙ্গিক নির্মাণের প্রচেষ্টা হিসেবে তিনি ক্রমাগত নিজের নাটকে গবেষণা করেছেন এবং আশির দশক থেকে বর্ণনাত্মক আঙ্গিকে নাটক রচনা শুরু করেন। তিনি এই বর্ণনাত্মক আঙ্গিকের নাম দিয়েছেন কথানাট্য। *চাকা* নাটক সম্পর্কে বলতে গিয়ে নাটকের রচয়িতা সেলিম আল দীন বলেন, 'বলতে বলতে নাটক, সেজন্যই কথানাট্য। একে কথকতাও বলা যায়। কিন্তু কথকতা অভিনয়রীতির নাম, নাট্যরীতির নাম নয়। উপরন্তু কথকতা বললে কথানাট্যের দাবী পূরণ হয় না।'[১]

এ অঞ্চলের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, মানুষের সংগ্রাম ও প্রেম উপস্থাপনে বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির বিকল্প দেখা যায় না। কথানাট্য সমৃদ্ধ এক বর্ণনাত্মক নাট্যাঙ্গিক যা শিল্পের সমস্ত সীমানা ভেঙে একটি চূড়ান্ত ও অদ্বৈত শিল্পরীতি তৈরি করে। সেলিম আল দীন যাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পদর্শন হিসেবে অভিহিত করেছেন। বাংলাদেশের বর্তমান নাট্যচর্চায় মনোনিবেশ করলে দেখা যায়, ইউরোপীয় নাটকের আদলে সংলাপসর্বস্ব যে নাট্যচর্চা তা আমাদের সুবর্ণ অতীতকে তুলে ধরে না। এ কারণে জাতীয় নাট্যাঙ্গিক নির্মাণের বিষয়টি অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে দরকারি হয়ে পড়ে। সেলিম আল দীন জাতীয় নাট্যাঙ্গিকের যৌক্তিকতা তুলে ধরার মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে পাঠক-দর্শকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন কথানাট্য, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও জাতীয় নাট্যাঙ্গিক নির্মাণে তার প্রচেষ্টার দিকে।

* উপ-পরিচালক, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা ও সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি)

বাংলা নাটকের উৎপত্তি-সংক্রান্ত বিভ্রান্তি

বাংলা নাটকের শুরু নিয়ে বিভ্রান্তি বিরাজমান। অনেকে মনে করেন, এই বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে সুকৌশলে। বাংলা নাটকের একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস থেকে বাংলা নাটককে বিচ্ছিন্ন করে যখন কেবল গেরাসিম স্তেফানোভিচ লেবেদেফে আটকে ফেলা হয় তখন এই জনপদে গড়ে ওঠা নাট্যপরিক্রমার পশ্চাতের মানুষদের অবদানকে প্রায় অস্বীকারই করা হয়। পাশাপাশি সহস্র বছর ধরে গড়ে ওঠা বাংলা নাটকের নিজস্ব ধারাটিকেও অস্বীকার করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় আমাদের নাটক হয়ে পড়ে শেকড়হীন, আমদানি করা শিল্প যার গোড়া পত্তন হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে। আবার যা আমদানি করে নিজেদের বলে দাবি করা হয় তা সত্যিকার অর্থে কতটা শিল্পের দাবি পূরণ করে তা নিয়েও মতভেদ আছে। আমাদের নাট্য ঐতিহ্যকে এ-রকম মৌলিকত্বহীন শিল্পচেতনা থেকে উদ্ধার জরুরি। বলতে দ্বিধা নেই যে, বাংলাদেশের অনেক নাট্যকার, নাট্যগবেষক, নাট্যবোদ্ধা এবং নাট্যকর্মী মনে করেন, বাংলা মঞ্চনাটকের শুরু রুশ নাট্যকার স্তেফানোভিচ লেবেদেফের হাতে, ১৭৯৫ সালে। কবীর চৌধুরী গতানুগতিক এই মতটিই সমর্থন করে বলেন, বাংলা সাহিত্যে নাটকের আবির্ভাব ঘটেছে কাব্যের অনেক পরে।[২] এ প্রসঙ্গে তিনি তার *প্রসঙ্গ নাটক* গ্রন্থের 'বাংলা নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব' রচনায় উল্লেখ করেছেন :

> বাংলা ভাষায় প্রথম মঞ্চায়নের কৃতিত্বের দাবীদার একজন বিদেশী। তার নাম হেরাসিম লেবেদেফ। এই ব্যতিক্রমধর্মী রুশ পর্যটক-বণিক ১৭৯৫ সালে জনৈক গোলকনাথ দাসের সহায়তায় কোলকাতায় 'দি ডিজগাইজ' নামক একটি নাটকের বাংলা অনুবাদ অভিনয় করান। বাংলা ভাষান্তরের নামকরণ করেন 'কাল্পনিক সংবদল'। এবার বাঙ্গালী জনসাধারণ বাংলা নাটক দেখার সুযোগ পেলো, যদিচ রূপান্তরিত নাটক।[৩]

১৭৯৫ সালে লেবেদেফ কর্তৃক ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ অভিনয় করানোর মাধ্যমে বাংলা নাটকের যাত্রা শুরু—এই মতটি গ্রহণ করা যায় না। কবীর চৌধুরীর মতো লেবেদেফের নাটক মঞ্চায়নকে বাংলা নাটকের শুরু বলে মনে করেন নাট্যকার ও অভিনেতা মামুনুর রশীদ। তিনি তাঁর *লেবেদেফ* নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন :

> আজ থেকে দুশো বছর আগে বাংলা মঞ্চ-নাটকের শুরু হয়েছিল। নানা মতান্তরে এটা সত্য একটা ঘটনা যে, কোলকাতায় ২৫ নং ডোমটোলায় নাটক অভিনীত হয়েছিল দর্শনীর বিনিময়ে। তাতে সাহায্য করেছিলেন বাংলার পণ্ডিত গোলক নাথ দাস। অভিনয় করেছিলেন এ দেশেরই নট-নটীবৃন্দ।[৪]

আসকার ইবনে শাইখও মনে করেন বাংলা মঞ্চনাটকের শুরু "১৭৯৫ সালে, কলকাতার ডোমতলায়"[৫]। খুব অবাক বিষয় এই যে, নাটকের ইতিহাস রচয়িতাগণও বাংলা নাটকের গোড়ার ইতিহাস অন্বেষণ করেননি। তারাও উৎপত্তির শুরু হিসেবে হেরাসিম স্তেফানভিচ লেবেদেফের অনুবাদ নাটক মঞ্চায়নকেই বুঝিয়েছেন। অজিত কুমার ঘোষও এ-রকম সময়কে বাংলা নাটকের আদিপর্বের শুরু বলে মত দেন :

> অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলাদেশে বিদেশী রঙ্গালয়ের সূচনা হইয়াছিল, তবে যিনি সর্বপ্রথম বাংলা নাট্যশালার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন তিনি হইলেন হেরাসিম লেবেডেফ নামে একজন রুশদেশবাসী বিদেশী। তিনি Bengaly Theatre নামে একটি নাট্যশালা স্থাপন করিলেন এবং তাহাতে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে তাঁহার ভাষা শিক্ষক গোলকনাথ দাসের দ্বারা Disguise I Love is the Best Doctor নামক দুইখানা ইংরাজী প্রহসনের বাংলা অনুবাদ করাইলেন। প্রহসন দুইখানির মধ্যে বাঙালী দর্শকের রুচি অনুযায়ী অনেক দৃশ্য ও চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছিল। Disguise-এর বাংলা অনুবাদ অভিনীত হইয়াছিল। সম্ভবত ইহাই প্রথম অভিনীত বাংলা নাটক (১৭৯৫–১৭ নভেম্বর)।[৬]

বাংলা নাটককে লেবেদেফের প্রচেষ্টার সঙ্গে বেঁধে ফেলা কোনোভাবেই যৌক্তিক নয়। বাংলা নাটকের উদ্ভব সহস্র বছর আগে। এ অঞ্চলের মানুষের নানাবিধ আনন্দবিনোদনের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের উদ্ভব এবং বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন ও বিকাশ লাভ হয়। এ বিষয়ে নাট্যগবেষক সৈয়দ জামিল আহমেদের বিশ্লেষণ উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি মনে করেন, 'গুটিকতক শহুরে অভিজাতের হাতে নয়, বরং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশেও ব্রিটিশ শাসনের বহু শত বছর আগে স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারাই নাট্যকলার গোড়াপত্তন হয়।'[৭]

বাংলা নাটকের সমৃদ্ধ ইতিহাস সম্পর্কে সৈয়দ জামিল আহমেদ মূলত সেলিম আল দীনের নাট্যভাবনার সাথে একাত্মতা পোষণ করেন। তিনি যৌক্তিকভাবে বিশ্বাস করেন বাংলা নাটক হঠাৎ করে কোনো বিদেশির একটি বা দুটি অনুবাদ নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে শুরু হয়ে যায়নি। সেলিম আল দীন তার *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য* গবেষণায় ঠিক এ-রকম উক্তি করেছেন:

> বাঙলা নাটক সম্পর্কে একটি সাধারণ বিশ্বাস এই যে–ভারতবর্ষে ইংরেজ শসনামলে–অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে উক্ত শিল্পমাধ্যমের উদ্ভব ও বিস্তার। সচরাচর কোনো কোনো নাট্য-ইতিহাস গ্রন্থেও এ ধারণা ব্যক্ত হতে দেখা যায় যে–বাঙলা সাহিত্যের ধারায় নাটকের প্রারম্ভকাল ঊনবিংশ শতাব্দী।
>
> কিন্ত বাস্তবে দেখা যায়–এ ধারণা ভ্রান্ত। পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙলা নাট্যসাহিত্যের আঙ্গিক ও উপস্থাপনারীতি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল মাত্র–কিন্ত তৎপূর্বে প্রায় সহস্র বৎসর ধরে এদেশে–বিভিন্ন ধারার নাট্যের প্রচলন ছিল। এমনকি সংস্কৃত নাট্যের নন্দনতাত্ত্বিক প্রভাবও মধ্যযুগে বাঙলা নাটকে ছায়াপাত করতে সক্ষম হয় নি। বাঙালির নাট্যরসপিপাসা চিরকালই স্ব-উদ্ভাবিত দেশজ শিল্পরুচির ধারায় নিবৃত্ত হয়েছে।[৮]

ভারতবর্ষে এসে নাটক নিয়ে গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফের অফুরান প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে বাংলা নাটকের উপস্থাপনাগত একটি দিকে অবদান রেখেছে। তার *The Disguise* বাংলায় অনুবাদ হয়ে অভিনীত হওয়ার পর বিশেষ করে ইংরেজি ভাষার নাটক বাংলায় অনুবাদ ও মঞ্চায়নের হিড়িক পড়ে। অনুবাদ থেকে সরে এসে এ আঙ্গিকে নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন অনেক নাট্যকার। সে দিক বিবেচনায় বলা যায়, লেবেদেফের এ উদ্যোগ পাশ্চাত্য নাটকের ধাঁচে বাংলা নাটকের এক প্রকার ধারা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে যে ধারাটি এখন দুর্ভাগ্যবশত বাংলা নাটকের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য ভায়োলিনবাদক এবং সংস্কৃত ভাষার ছাত্র লেবেদেফ অনেক অপমান নিয়ে ভারত ত্যাগ করেছিলেন।

লেবেদেফের অবদান অস্বীকার না করেও বাংলা নাটকের ইতিহাস এবং উৎপত্তির গোড়া সন্ধান করলে দেখা যায়, বাংলা নাটকের হাজার বছরের ইতিহাস আছে যা আমাদের ঐতিহ্যকে সম্মানের সাথে বিশ্বসাহিত্যে উপস্থাপনের যোগ্য করে। এ কারণে বাংলা নাটকের উৎপত্তিকে গোড়ার ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে সামগ্রিক নাট্যচর্চা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। এ উপলব্ধি থেকে নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন তার লেখা নাটকে হাজার বছরের সেই ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে লালন করেন। হয়তো এ কারণে তাঁর নাট্যসাহিত্য একটি আলাদা ধারা তৈরি করে। তিনি বাংলা নাটকের বর্তমান ধারার পিছনের হাজার বছরের পথপরিক্রমাগুলোকে নানাভাবে ভাঙাগড়ার মাধ্যমে নিজের নাটকের সমৃদ্ধি সাধন করেছেন এবং সহস্র বছর ধরে গতি লাভ করা বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে কথানাট্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শুরুর দিকে সংলাপ নির্ভর স্যাটায়ারধর্মী নাটক লিখলেও তিনি অনবরত একটি দেশজ নাট্যাঙ্গিক নির্মাণে চেষ্টারত ছিলেন। এ বিষয়ে অরুণ সেন লিখেছেন :

> গোড়াকার কয়েকটি নাটকেই, অ্যাবসার্ড ও স্যাটায়ারের আদল হয়তো সমকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতারই পরিণাম, পরবর্তীকালে যাকে সমালোচনা করেই সেলিম তার স্বকীয়তার যাত্রা শুরু

> করেছেন। কিন্তু তার আগে যেন তিনি সাধ্যমতো জেনে নিলেন সেই পরবাসী নাট্যচর্চার স্বরূপ, এবং সেই নাট্যে কর্তৃত্ব অর্জনের পরই যেন তাঁর অধিকার জন্মাল তাকে বর্জন করার।[৯]

দেশীয় নাট্যাঙ্গিক নির্মাণের পথে তার প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে শিল্পে 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ'। এই চেতনা বা দর্শনের ভিতর দিয়ে সাহিত্যের বিভিন্ন ধরনের সীমানা ভেঙে এক চূড়ান্ত শিল্পসত্ত্বার সৃষ্টি হয় যা অদ্বৈত। শিল্প সৃষ্টির এই মহান দর্শনের ভিতর দিয়ে তিনি বাংলা নাটকের জন্য একটি আঙ্গিক নির্মাণে সচেষ্ট হন যাকে তিনি কথানাট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। জাতীয় নাট্যাঙ্গিক নির্মাণে তার প্রচেষ্টা তার বহুল আলোচিত নাটক *চাকা* থেকে পূর্ণমাত্রায় শুরু হয় বলে অনেক গবেষক মনে করেন। বর্ণনাধর্মী নাট্যরীতির এ জাতীয় নাটকগুলোকেই তিনি কথানাট্য হিসেবে অভিহিত করেছেন।

কথানাট্য ও জাতীয় নাট্যাঙ্গিক নির্মাণ ভাবনা

বাংলা নাট্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আঙ্গিক ও অভিনয়ের বর্ণনাধর্মিতা। বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এসে ঔপনিবেশিক আমলের নাট্যপ্রচেষ্টা দ্বারা দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইউরোপীয় ধাঁচের নাটককেই মানুষ নাটক বলে ধরে নেয়। এ অঞ্চলের ভূমিজাত হয়েও বাংলার সাধারণ মানুষের নাটক শহুরেদের নিকট অস্পৃশ্য পরিগণিত হয়। সেলিম আল দীন বলেন :

> নাটক হয়েও আমাদের নাটক গান থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নি–নৃত্যকে করেছে তার ধমনী–কাব্যের গড়নটাকে প্রায় সর্বত্র করেছে আপন অঙ্গাভরণ–তার প্রাণের নিখিল লোকায়ত জীবন ও ধর্মকে অবলম্বনপূর্বক আসর থেকে আসরে পরিপুষ্ট হয়েছে। যেখানে কাব্য বা উপাখ্যানটা গেয় সেখানেও বাঙলা নাটকের রূপ ও রস স্পর্শ করা গেছে। আমাদের জনপদে নাটক এসছে কৃত্যের ছদ্মবেশে।[১০]

কথানাট্য এ অঞ্চলের মানুষের মাঝে গড়ে ওঠা এক প্রকারের নাট্যরীতি বা নাট্য-আঙ্গিক। সাধারণ গ্রামীণ জীবনে নিজেদের মধ্যে আনন্দ-বিনোদনের যে কয়েকটি মাধ্যম গড়ে উঠেছিল কথানাট্য তার একটি। গবেষকগণ ধারণা করেন, কথানাট্য এখন থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে বিকাশ লাভ করেছিল। সাধারণ মানুষের অবসর সময়ের বিনোদন-মাধ্যম হিসেবে ক্রমাগত পূর্ণতা লাভ করা এ মাধ্যমটি আসলে একটি অভিনয়রীতি। খোলা মাঠ, প্রার্থনালয়ের সামনের উন্মুক্ত স্থান কিংবা বাড়ির আঙিনায় জমে উঠত কথানাট্যের আসর। মেলা বা এ জাতীয় অনুষ্ঠানের উন্মুক্ত মাঠে তিন বা চারদিকে ঘিরে থাকা দর্শকের মধ্যে পাটি ও মাদুর বিছিয়ে নাটকের প্রদর্শনী হতো। কথানাট্য কাল পরিক্রমায় ধ্রুপদ সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছিল। কথানাট্য নিয়ে সৈয়দ জামিল আহমেদ লিখেছেন :

> "কথানাট্য" এমন এক ধরনের নাট্যরীতি যেখানে একজন মাত্র কুশীলব (গায়েন অথবা কথক) গদ্যে, পদ্য-ছন্দে অথবা গীতের মাধ্যমে কোন কাহিনী পরিবেশন করেন। কখনো তাঁর হাতে থাকে একটি চামর এবং পায়ে ঘুঙুর। কাহিনীতে বর্ণিত চরিত্রের ক্রিয়াকর্ম তিনি বর্ণনাত্মক অভিনয় দ্বারা উপস্থাপন করেন এবং কখনো তাঁর পরিবেশনে নৃত্য যুক্ত হয়। পরিবেশন স্থলের এক অংশে (মধ্যে অথবা এক পাশে) উপবিষ্ট দোহার ও যন্ত্রীদল পরিবেশনার গীত অংশে কণ্ঠ ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গায়েনকে সহায়তা দান করেন।[১১]

এই নাট্যরীতিতে এখনো বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে কাহিনি বা ঘটনা উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। মূল গায়েন মাটিতে বা উঁচু করে তৈরি করা মঞ্চের মতো স্থানে দর্শক বেষ্টিত হয়ে ঘুরে ঘুরে ও নেচে ঘটনার বর্ণনা করেন, সংলাপ বলেন এবং মাঝে মাঝে দোহারগণও প্রয়োজনে চরিত্র ধারণ করে মূল গায়েনের সাথে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমান সময়ে সংলাপধর্মী নাটকের সাথে এই নাট্যরীতির মিশ্রণও লক্ষ করা যায়। যেহেতু কথানাট্য একটি নাট্যরীতি বা নাট্যাঙ্গিক, কোনো নাটক নয় সেহেতু সংলাপধর্মী কোনো নাটলিপি সন্ধান যৌক্তিক নয় কারণ "কথানাট্য মূলত বর্ণনাত্মক অভিনয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এর লিখিত পাঠের জন্য অভিনেতাগণ বরাবর নির্ভর করেন এক প্রকার বর্ণনাধর্মী কাব্যের উপর"[১২]। অনেকে ধারণা

করেন, কথানাট্য বিভিন্ন লোকশিল্পের উপস্থাপনরীতির সংমিশ্রণে কালের পরিভ্রমণে গড়ে ওঠা একটি শিল্পাঙ্গিক যা দৃশ্যকাব্যের জন্য বেশি যুৎসই।

এই বর্ণনাধর্মী কাব্য ত্রয়োদশ শতকের আগ পর্যন্ত মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এর পর লিপিবদ্ধ হবার পর এসব কাব্য বা ঘটনা থেকে উপস্থাপনের উপযোগী করে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করতেন কথক অথবা কখনও কখনও মূল গায়েন। তার চারপাশে দর্শক বসে এসব কথানাট্য উপভোগ করতেন। সৈয়দ জামিল আহমেদ কথানাট্যের অন্তর্ভুক্ত এসব বর্ণনামূলক কাব্যের বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য বিচার করে চারটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেন :

ক) *রামায়ণ* ও *মহাভারতে* বর্ণিত আর্যদেবতা ও অবতারগণের কাহিনীভিত্তিক
খ) মঙ্গলকাব্যসমূহে বর্ণিত স্থানীয় অনার্য দেবদেবীর কাহিনীভিত্তিক
গ) মুসলিম ঐতিহ্যবাহী বীর ও সাধুগণের কাহিনীভিত্তিক
ঘ) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও ধর্মনিরপেক্ষ লোককাহিনী ভিত্তিক[১৩]

সৈয়দ জামিল আহমেদ মঙ্গলকাব্যভিত্তিক কথানাট্যকে বাংলার জাতীয় নাট্যকলা হিসেবে উল্লেখ করার প্রয়াসী। এর কারণ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন :

> আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্ম বিষয়ক আখ্যান-কাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিতি। বাংলার পল্লীর জনসভায় ইহার উদ্ভব হইলেও শেষ পর্যন্ত রাজসভায় ইহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইহা বাংলাদেশের একটি বিশেষ যুগের সাহিত্যসাধনা হইলেও, ইহার সৃষ্টিপ্রেরণা কোন একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাস হইতে আসে নাই।[১৪]

মঙ্গলকাব্যভিত্তিক কথানাট্য মধ্যযুগে এতটাই শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে যে গবেষকগণ মনে করেন, একে বাংলার জাতীয় নাট্য-আঙ্গিকের মর্যাদা দেওয়া যায়। এ থেকে পরিষ্কার হয়, বর্তমান সময়ে জানপদ নাট্য-আঙ্গিকে নাট্যরচনা এবং মঞ্চায়ন আমাদের ঐতিহ্যে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টা। শেকড় অস্বীকার করে ঔপনিবেশিক আমলে ইউরোপের নাট্য আঙ্গিক ব্যবহার করে নাটক রচনা এবং মঞ্চায়ন আমাদের বিপুল সম্ভাবনার অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রয়াস। উপনিবেশ আমলে খুব স্বাভাবিকভাবে বাংলার নাট্যকলা ইউরোপীয় নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই প্রভাব পরবর্তী সময়গুলোতে চলমান থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থা, সাম্প্রতিক সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার এবং গণমাধ্যমের উন্নয়নের কারণে বিশ্বনাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে এবং করছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'রঙ্গমঞ্চ' নামক নিবন্ধে লিখেছেন :

> বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত; তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য; তাহাতে লক্ষীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার চেয়ে ধনীর মূলধন বেশি থাকা চাই। দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি এবং কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারি দিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসন্তানের মতো কাজ হয়।[১৫]

'বিবর্তনের পথ পরিক্রমায় বাংলা নাটক নানা পরীক্ষণ বা গ্রহণ বর্জনের পর বর্তমানে যে অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে তাকে এক কথায় ঋদ্ধ বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না।'[১৬] বাংলাদেশে বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নাটক সমৃদ্ধি লাভ করলেও তা একটি সুসংগঠিত অবস্থা তৈরি করতে পারেনি। নাটকের

দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং স্বাধীন বাংলাদেশে নাট্যচর্চা বেগবান থাকলেও একটি জাতীয় নাট্যাঙ্গিক নির্মাণের প্রশ্নে এ দেশের নাট্যকার, নাট্যগবেষক, অভিনেতা, নাটকের শিক্ষক ও নাটকের সাথে সংশ্লিষ্টগণ এখনও একটি ঐকমত্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছেন। বাংলার সাধারণ জনগণের দ্বারা উদ্ভূত নাট্যকলা বহু বছরের পথ পরিভ্রমণে ঔপনিবেশিক অষ্টাদশ শতকে এসে জোরে ধাক্কা খেয়েছে। তখন থেকে অনেকে নাটক বলতে ইউরোপীয় প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে বুঝতে শুরু করেছিলেন। তখন থেকে বাংলার জনপদে গড়ে ওঠা নাট্যরীতি শহুরেদের কাছে অস্পৃশ্য হয়ে ওঠে।

বাংলা নাটকের মূল থেকে সরে যাওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি সেলিম আল দীন। এ কারণে তিনি নাটকের ঔপনিবেশিক সংস্করণ এবং ঔপনিবেশিক নাট্যভাবনা থেকে সরে এসে নিজস্ব নাট্য-আঙ্গিক নির্মাণে সচেষ্ট হন। ঔপনিবেশিক সময়ের অনেক শব্দ ও শব্দগুচ্ছও তিনি পরবর্তীকালে পরিহার করেছেন; যেমন তার *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য* অভিসন্দর্ভটিতে তিনি 'লোকনাট্য', 'লৌকিক নাট্য', 'লৌকিক ধারা' ইত্যাদি ঔপনিবেশিক শব্দের পরিবর্তে 'ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা' শব্দগুচ্ছ ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন।[১৭] তাই তিনি বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ অতীতের সাথে সংযুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। বিশেষ করে মধ্যযুগের বাংলা নাটক দ্বারা তিনি ব্যাপকভাবে আলোড়িত হয়েছেন। তাঁর সার্থক প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং দেশে ও বিদেশে ব্যাপকভাবে আলোচিত নাটক *চাকা*। নাট্যকার নিজে এ নাটকটিকে কথানাট্য হিসেবে অভিহিত করেছেন। *চাকা* থেকে পরবর্তী নাটকগুলোতে বর্ণনাত্মক আঙ্গিক ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পের সব সীমানা ভেঙ্গে নতুন এক শিল্প হিসেবে গড়ে তুলেছেন যাকে তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্প হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে তিনি *কিত্তনখোলা* থেকে আঙ্গিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পদর্শন

সেলিম আল দীন থিয়েটারকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী দর্শনাশ্রয়ী মাধ্যম হিসেবে অভিহিত করেছেন। তার মতে, 'মনে হলো প্রাচ্যের পথেই বিশ্বসাহিত্যের পুনরুদ্ধার ঘটতে পারে। বহুকে এক করে একের মধ্যে বহুকে এক নিপুণ শিল্প ঐক্যে সংহত করাতেই খ্রিস্টীয় একবিংশ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব'।[১৮] দ্বৈতাদ্বৈতবাদ মূলত শিল্পের এমন এক দর্শন যা শিল্পের বিভিন্ন রূপ ও আঙ্গিককে একত্র করে একক ও অদ্বৈত অবস্থা গড়ে তোলে। সেলিম আল দীন মনে করেন, নাটক নিজে একক কোনো শিল্প মাধ্যম নয়। পাশাপাশি, কথাসাহিত্য, কাব্য ও নাটকের মধ্যকার সীমানা দেয়াল ভেঙ্গে এমন এক শিল্পমাধ্যম তৈরি করা যায় যা শিল্পের সব শাখাকে উপস্থাপন করবে। কোনো শিল্পকেই বিচ্ছিন্নভাবে না চিনে এমন একটি ফর্ম বা রূপ প্রদান করা যেতে পারে যাতে এর ভিতরে সব শিল্পকেই চেনা যাবে। এ অঞ্চলে মধ্যযুগে নাটকের যে রূপ ও আঙ্গিক গড়ে উঠেছিল নাটক সেই অজস্র রূপকে ধারণ করে বর্ধিত হয়েছে। সংগীত, নৃত্য ও কৃত্যের বর্ণনা, ধর্ম, পুরাণ এবং মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ক্রিয়াকলাপ একসাথে উপস্থাপিত হতো বিভিন্ন আসরে। শুধু সংলাপ নির্ভর ইউরোপীয় নাট্যাঙ্গিক এ অঞ্চলের নাট্যকারদের নাটককে প্রভাবিত করেছিল বটে, কিন্তু তা আমাদের নিজস্ব নাট্যাঙ্গিককে কখনো তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। সেলিম আল দীন এক সাক্ষাৎকারে বলেন :

> মধ্যযুগে বাঙালি মানসে অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদী দর্শন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই দর্শনটাকে নতুন করে বাংলা শিল্পতত্ত্বে উপস্থাপনের প্রত্যাশী আমি। অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ভারতীয় আধ্যাত্মসাধনা এবং ইরানি সুফিতত্ত্বের মিশ্র প্রভাবজাত। *কিত্তনখোলা* রচনাকালে আমার আবিষ্টতা সম্ভবত এমন এক শিল্পবিন্দুতে স্থির হয়েছিল, যাতে নানা শিল্পমাধ্যম সম্পর্কে আমার নৈয়ায়িক ভেদবোধ লুপ্তদশা প্রায়। ১৯৮১-৮২ সালে আমার মনে হয়েছিল যে, কোথাও লেখাটা শেষ পর্যন্ত আর প্রচলিত অর্থে নাটক থাকছে না। একটা বিশেষ মাধ্যমের নিয়ম এবং রীতি নিজস্ব আঙ্গিকে আকৃতি পেতে চায়। শিল্পীর কাজ আঙ্গিকের মধ্যে, আঙ্গিক ভাঙার কাজটাকে চূড়ান্ত করা। তা না হলে শিল্প

> কখনো শিল্পতীর্থে পৌঁছতে পারে না। ধরা যাক, সংগীতের কথা। তার একটি নিজস্ব রূপ এবং পদ্ধতি আছে। কিন্তু আমি যখন ভাস্কর্য গড়ছি, তখন ভাস্কর্য রূপরীতির সঙ্গে সংগীতের ঝংকার মেশাতেই হবে। অন্তত রোমান মাস্টাররা তো তাই বলেছেন। দর্শকের দিক থেকেও সংগীতের বোধ ব্যতিরেকে ভাস্কর্য বোঝা অসম্ভব। প্রাচীন এপিকগুলোর কথাই ধরা যাক, এপিক শুধু নবরসের আকর নয়, এতে ভূগোলবিদ্যা থাকে, সমাজনীতি, পোশাক-আশাক, বসন–সব মিলিয়ে একটি সৃষ্টিশীল বিশ্বকোষ। এপিকে কাহিনীও আছে, আবার এর আশ্রয় সংগীত। এপিক গোটাটাই কাব্য, আবার গোটাটাই সংগীত।[১৯]

সেলিম আল দীন শিল্পতত্ত্বে যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সংযোগ তৈরি করেন, তা আমাদের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর একসাথে মিশে থাকার দর্শন। বাংলা জনপদের সহস্র বছরের শিল্পযাত্রা বিচার করলে তা প্রমাণিত হয়। সেলিম আল দীন বাংলা নাটকের ভিতর দিয়ে পুনর্বার তা ফিরিয়ে আনতে চান। তিনি মনে করেন, 'ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্যমাত্রই উপাখ্যান আঙ্গিকের।'[২০] তার *স্বর্ণবোয়াল* নাটকটিও আঙ্গিকগত দিক থেকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পরীতিতে রচনা করেছেন।[২১] ফলে দেখা যায়, শিল্পে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ আসলে বহু শিল্পের সংমিশ্রণের ভিতর দিয়ে লাভ করা একটি শিল্প উপস্থাপন রীতি। কথানাট্য শিল্পে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পদর্শনকে প্রমাণ করে। অন্যভাবে বলা যায়, কথানাট্য মূলত দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্প আঙ্গিক বা নাট্য আঙ্গিক যা হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় মধ্যযুগে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। সেলিম আল দীন তার জীবদ্দশায় কথানাট্যের মাধ্যমে একটি জাতীয় নাট্যাঙ্গিক নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। নিজের গড়া ঢাকা থিয়েটার ও গ্রাম থিয়েটার বাংলার নিজস্ব নাট্যাঙ্গিক নির্মাণে বদ্ধপরিকর। এ-ক্ষেত্রে তার শিল্পসহচর নাসির উদ্দিন ইউসুফ ও শিমুল ইউসুফ। তবে সেলিম আল দীনের মৃত্যুর পরে এ বিষয়টি অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী চেতনায় শিল্প রচনায় তরুণদের উৎসাহিত করেছেন সেলিম আল দীন। বিভাস চক্রবর্তীর আমন্ত্রণে কোলকাতায় তিনি 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব ও নব্যকালের শিল্প সৃজন বিষয়ে প্রস্তাব' নামক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ নিবন্ধে তিনি বলেন :

> বাঙালির সহস্র বর্ষের শিল্পরীতির প্রধান লক্ষণ, নৃত্য সঙ্গীত বর্ণনা, সংলাপের কৌশলে আখ্যান পরিবেশনা। চর্যাপদ থেকে ভারতচন্দ্র, এবং নগরকেন্দ্রিক আধুনিক সাহিত্যের প্রায় সাধনার বৎসরের অংশটুকুর আড়ালে তখনও বৃহত্তর কৃষিজীবী সমাজের শিল্পধারা বাঙালির চিরায়ত রুচির ধারায় প্রবাহমান।[২২]

'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী পন্থায় শিল্প সৃজন, প্রাচীন শিল্পরীতির পুনরাবৃত্তি কিনা'[২৩] এ প্রশ্নটি সেলিম আল দীন নিজেই রেখেছেন তার বর্ণিত প্রস্তাবনায়। উত্তরও তিনি নিজেই দিয়েছেন, 'একজন শিল্প স্রষ্টার পক্ষে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সুস্পষ্ট প্রেরণায় কাজ করা অসাধ্য ও অযৌক্তিক কিছু নয়।'[২৪] তার এই প্রবল বিশ্বাস থেকে তিনি সহস্র বছরের বাংলা নাটকের উৎপত্তির ধাপগুলো এবং এ জনপদের মানুষের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে লালিত হওয়া বিভিন্ন মাধ্যম একত্র করে বর্ণনাত্মক নাট্যরীতিতে নাটক রচনা ও দেশজ নাট্যরীতিকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে তার নাট্যচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। কথানাট্য ঐতিহ্যময় বর্ণনাত্মক নাট্য আঙ্গিক যা মূলত দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পদর্শন-সমর্থিত। সেলিম আল দীন এই শিল্পদর্শন মাথায় রেখে কথানাট্য *চাকা*সহ পরবর্তী অন্যান্য নাটক রচনা করেছেন। এ বিষয়ে গ্রাম থিয়েটারের ঘোষণাপত্র উল্লেখ করা যেতে পারে :

> বাংলাদেশের মঞ্চে ...আমরা আমাদের নিজেদের জীবন, পরিমণ্ডল ও লড়াই-এর চিত্র তুলে ধরতে চাই। গ্রাম থিয়েটার মেরুদণ্ডহীন আপোসকামী নাট্যচর্চার বিরুদ্ধে প্রাণবন্ত ও প্রাণদায়ী নাট্যচর্চাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ...গ্রাম থিয়েটার আধুনিক নাট্যকলার সঙ্গে বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্য-আঙ্গিকের সমন্বয় সাধনে বদ্ধপরিকর।[২৫]

সেলিম আল দীনের কথানাট্য

সেলিম আল দীন নাটক উপস্থাপনে দেশীয় নাট্যাঙ্গিক ব্যবহারের মাধ্যমে নিজস্বতার দিকে ফিরে যাবার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা না হলে বাংলা নাটকের সমৃদ্ধ অতীতের কথা ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে, আমাদের নাটকের ইতিহাস আটকে যায় দুই শত বছরে। এ কারণে, এর প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে সেলিম আল দীন দেশীয় নাট্যাঙ্গিক নির্মাণে নিবেদিত হন। অনবরত নিরীক্ষার মধ্যে আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে দ্বৈতাদ্বৈত শিল্পদর্শনে বর্ণনাত্মক আঙ্গিকে নাটক রচনা করেন। এখানে কথাই মুখ্য। কথা মুখ্য বলেই তা কথানাট্য :

> আমি কথার শাসনে নাটক রচনা করেছি, তাই এর নাম দিয়েছি কথানাট্য। গৃহাঙ্গনে কথক যে কিসসা বলেন দোহারদের সঙ্গে এ নাটকের আঙ্গিক পরিকল্পনায় সে রীতির শিক্ষাটা সক্রিয় ছিল। গ্রাম থিয়েটারের কাজে এ দেশের নানান অঞ্চলে যাই বলে এ দেশের শিল্প শস্যক্ষেতের নানান সুগন্ধি ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাই। পূর্ব পুরুষের সমৃদ্ধ ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কৃষকের সাহস বাড়ে। নইলে একজন গায়েন আমার হাতের লেখায় সত্তর বাহাত্তর পৃষ্ঠার নাটক গাইবেন এ ধারণা ইউরোপীয় ধাঁচের নাটক থেকে পাবার কথা নয়।[২৬]

কিত্তনখোলা থেকে সেলিম আল দীনের এই বাঁকবদল শুরু হয়। তিনি একেবারে ইউরোপীয় ধাঁচের সংলাপনির্ভর নাটক রচনা থেকে সচেতনভাবে সরে আসেন। *চাকা*, যৈবতী কন্যার *মান*, *হরগজ* ও *স্বর্ণবোয়াল* নাটকগুলো তিনি 'কথার শাসনে' রচনা করেন। *চাকা* নাটকের গ্রন্থমুখে সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক লিখেছেন:

> বাংলার ধূলিতে ও কাদার পটে অনবরত দাগ কেটে যাওয়া চাকার প্রতীকে সেলিম আল দীন মানুষের জীবনের যে মৌল কথাটিকে দেখতে পান, সেই কথা প্রকাশের জন্য তাঁকে সন্ধান করতে হয় কথাবিন্যাসের নতুন একটি চেতনা – সংলাপ নির্ভর নাটক তাঁর কাছে যথেষ্ট মনে হয় না, আবার কেবল দেহছন্দ–নাচ–অভিনয় সকল কিছু তাকে এঁটে উঠতে পারে না, উপন্যাসের ধারাবর্ণনাও তার নিকট– বলে মনে হয় না, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এবং ব্যক্তি-সমাজ-সংগ্রাম তাকে অবিরাম দুলিয়ে দিতে থাকে ভূত-ভবিষ্যত, এমত মুহূর্তে আমাদের এই নাট্যকার এক নতুন সাহিত্য মাধ্যম আবিষ্কার করে ফেলেন––কথানাট্য––যা নাটক, কবিতা, নাচ, গীত, উপন্যাস উপকথা ও কথকতার সমাহার।[২৭]

বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এখানে একজন প্রধান গায়েন থাকে। তার সাথে থাকে দোহার। মূল গায়েন নেচে গেয়ে সুরে ও বর্ণনায় ঘটনা বা কাহিনি বলে যায়। সে বিভিন্ন বস্তু হাতে নিয়ে কাহিনির প্রয়োজনে প্রফস হিসেবে ব্যবহার করে। দোহারদের অনেকের কাছে ঢোল বা অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্র থাকতে পারে। মূল গায়েনের সাথে দোহারগণ মাঝে মাঝে বিভিন্ন চরিত্র ধারণ করে। প্রয়োজনে তারা কণ্ঠ পরিবর্তন করে সেই চরিত্রের কাছাকাছি যেতে চায়। বর্ণনাত্মক এ আঙ্গিকগুলোর মধ্যে তারতম্যও দেখা যায়। *চাকা* নাটকে 'কথকের বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খতায় তৈরি হয় গ্রামের ও পথের দৃশ্যসমূহ এবং তারই মধ্যে এসে পড়ে গুটিকয়েক চরিত্র, এবং কাহিনির একমুখী সরল অবয়ব।'[২৮] এ কথানাট্যের শুরু হয় এভাবে :

> একদিন বৈশাখের কোন এক সকালে কাকেশ্বরী নাম গাঙের পাড়ে একটি গঞ্জ এলংজানি পূর্বদিকের সম্মুখে পশ্চিমে অবস্থান হেতু সুর্যালোকে স্থানে স্থানে ঝলমল করে।।
> কোথায় কোথায় ঝলমল করে?
> তবে শোন ধান তিল সরিষা ও গুড়ের আড়তের চালে যেখানে যেখানে ঢেউটিনের নতুন বান * সূর্যের প্রতিফলনও এক ধরনের আলোকিত ফলন এ কথা মান কিনা?
> আর কোথায়?
> হাটবারের সারে সার চালাঘরে এখন শূন্য বটে ভাঙা চালে প্লাস্টিকের ছাউনীতে।।
> আর কোন কিছু?[২৯]

তাহলে বোঝা যায়, নাটকের শুরুতে একজন আখ্যান বর্ণনা শুরু করে। প্রশ্ন করা যায় এমন কেউ সামনে আছে। প্রশ্ন এবং উত্তরের ভিতর দিয়ে ঘটনা এগিয়ে চলে। অথবা 'শ্রোতৃ-দর্শকমণ্ডলী। দৃশ্য ও শ্রবণের দ্বৈত নিখিল যেখানে অভেদাত্মা–সেই শিল্পরীতির আশ্রয়ে রচিত এই কথানাট্য–যৈবতী কন্যার মন।'[৩০] দেখা যায়, 'নাটকের প্রধান ভূমিকা সূত্রধারের– সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার নয়, বরং বাংলার কথক বা গায়েনেরই সগোত্র। নাটকের আগাগোড়া এই কথকের বর্ণনা।'[৩১] আখ্যান বর্ণনাকারী আখ্যান বর্ণনার বিভিন্ন জায়গায় সামনের দর্শকদের 'হে দর্শক শ্রোতৃমণ্ডলী', 'অতঃপর হে দৃশ্য ও বর্ণনা পিপাসু সুধী মণ্ডলী'[৩২] এ জাতীয় সম্বোধনবাচক শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে দর্শকদের সম্বোধন করে। এখানে উল্লেখ্য যে, *চাকা* কথানাট্যে নাট্যকার দাঁড়ি–কমা–সেমিকোলন অর্থাৎ যতিচিহ্ন ব্যবহার করেননি কারণ নাট্যকারের ভাষায়, 'বাক্যের নিজস্ব পরিধিতেই এর অর্থজ্ঞাপকতা বিদ্যমান।'[৩৩]

হাজার বছর ধরে চলে আসা নাট্য আঙ্গিক এবং এর বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরাণ ও লোককাহিনি নির্ভর। সেলিম আল দীন কথানাট্যে পুরাণনির্ভরতা কমিয়ে সাধারণ মানুষের কথাকে অথবা সমকালের বিষয়কে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, 'কথানাট্যে পুরাণ বহির্ভূত বা লোককথা বহির্ভূত নাট্যবস্তু নির্বাচনের ইচ্ছা আমার বহুদিনের।'[৩৪] বর্ণনাত্মক আঙ্গিকে মধ্যযুগের বিষয় থেকে সরে এসে বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচিত কথানাট্য *চাকা* আমাদের জাতীয় নাট্যাঙ্গিক নির্মাণের ক্ষেত্রে অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করে। *যৈবতী কন্যার মন* বা পরবর্তী নাটকগুলোতে তিনি সম্পূর্ণভাবে পুরাণ বা লোককথা থেকে কাহিনি নির্বাচন করেননি। তার তিনটি নাটক নিয়ে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত একটি সংকলনের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

> শুধু নাটক রচনা করলেও শিল্পমাধ্যম সম্পর্কে আমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। কেননা শিল্পের সমস্ত রঙ, শব্দ, চিত্র, পাথর, নীলিমা, অগ্নি ও বরফ, শেষ পর্যন্ত পুরুষ অর্থাৎ মানবাভিসারী।
>
> আমি এই প্রত্যয়ে বদ্ধমূল যে হাজার বছরের বাঙলা নাটকের আঙ্গিক সাধনাতেই আমাদের জাতীয় নাট্যরীতির প্রকৃত উজ্জীবন সম্ভব। পূর্বাঞ্চলীয় জনপদের প্রাকৃত ও কর্মমুখর ভাষাতেই রচিত হবে আগামী দিনের মহানাটক।[৩৫]

বাংলা নাটকের আঙ্গিক সাধনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের নাট্যাঙ্গিকে বর্তমান সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে মহানাটক নির্মাণের অভিপ্রায় ছিল সেলিম আল দীনের। *চাকা*, *যৈবতী কন্যার মন*, *হরগজ* ও *স্বর্ণবোয়াল*-এর বর্ণনাভঙ্গি অনেকটাই এক রকম।[৩৬] অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে সেলিম যে প্রস্তুতি নিয়েছেন–তার পঠনপাঠন ও সাধনায় একটি দেশীয় নাট্যাঙ্গিক নির্মাণ এবং সেই আঙ্গিকের ভিতর দিয়ে *চাকায়* উপস্থাপনের জন্য তিনি নির্বাচন করেন সমকালের রাজনৈতিক এক বিষয়:

> ১৯৮৬-৮৭ সালের গণঅভ্যুত্থান আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হলে অন্য সবার সঙ্গে আমিও সমান বিচলিত হই। রাজনৈতিক দলের বাদানুবাদের আবর্তে শহীদদের শব নামপরিচয়হীন দিগন্তের দিকে ভেসে যায়—এ রকম বেদনা এই চাকা নাটকের মূলে আছে।[৩৭]

সমকালীন একটি রাজনৈতিক বিষয়কে কথানাট্যে উপস্থাপন একটি চ্যালেঞ্জ ছিল বটে। এ ছাড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগের পরিভাষাকে বর্তমান থিয়েটারে ব্যবহারের সাহস দেখিয়েছেন সেলিম আল দীন। কাকেশ্বরী নদীর পারে এলংজানি গঞ্জে চাকা সারানোর জন্য থামে দিল সোহাগীর বিলে ধান কাটতে রওনা দেওয়া গাড়োয়াল ও চার সঙ্গী। সরকারি হাসপাতালে একটি পরিচয়হীন 'অপঘাতের লাশ' এলে তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয় তাদেরকে। তারা প্রথমে নিমরাজি থাকলেও অনুরোধ আর পঞ্চাশ টাকার জন্য লাশ যথাস্থানে পৌঁছে দিতে রাজি হয়। প্রায় অস্পষ্ট হাতের লেখা, মৃতের নাম হোসেনালি বা হানিফালি আর গ্রামের নাম নবায়পুর বা নয়ানপুর। অপরিচিত একটি লাশ নিয়ে ঘুরতে থাকে গাড়ির চাকা। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন তারা লাশটির ঠিকানা পায় না, তখন তারা ধর্মালয়ের শরণাপন্ন হয়। সেখানেও তারা বিমুখ হয়। তারপর প্রায় গলিত লাশ নদীর পাড়ে গর্ত করে তাতে পুঁতে দেয়। এই

সাধারণ একটি গল্পের সাথে জড়িয়ে থাকে জীবিত ও মৃতের মধ্যে এক দিনে তৈরি হওয়া সম্পর্ক, মানবিক বোধ, জীবিতদের অমানবিকতা, ধর্মের দায় এড়িয়ে চলা। চাকার সাথে চলমান ও থমকে যাওয়া জীবনের গভীর এক সম্পর্কও। *যৈবতী কন্যার মন* নাটকে তিনি তুলে এনেছেন মধ্যযুগের ও বর্তমান সময়ের দুই যুবতী নারীর কথা, যাদের জীবনের সমাপ্তি হয়েছে আত্মহননের মাধ্যমে। *হরগজ* কথানাট্যের ঘটনা ১৯৮৯ সালে মানিকগঞ্জ জেলার হরগজ নামক স্থানে ঘটে যাওয়া প্রলয়ঙ্করী ঘুর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া জনপদের ঘটনা।

সমকালের রাজনৈতিক বাস্তবতা বর্ণনাত্মক আঙ্গিকে বর্ণনা, সংলাপ ও সংগীতের দ্যোতনায় উপস্থাপন করলেন সেলিম আল দীন। *চাকা*, *যৈবতী কন্যার মন*, *হরগজ* ও *স্বর্ণবোয়াল* ইউরোপীয় নাটকের খাঁচা ভেঙে বের হয়ে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পদর্শন মেনে হয়ে উঠল কথানাট্য। আক্ষরিক অর্থেই কেউ এসব নাটককে উপন্যাস বলে চালিয়ে দিতে পারেন। কেউ আবার প্রাণবন্ত কবিতা বলেও উল্লেখ করতে পারেন। আবার চাকার অবিরাম চলার ভিতরে যে সংগীতের মূর্ছনা আছে তাতে *চাকা* গীত হবার যোগ্যতা রাখে। পাশাপাশি, *চাকা*কে আরও মূলানুগামী করার অভিপ্রায়ে সেলিম আল দীন একে দাঁড় করান সংস্কৃত কাহিনিসম্ভার *কথাসরিৎসাগর*[৩৮]-এর কাঠামোতে। নাট্যকার *চাকা*র আখ্যান লম্বক/কথাপীঠ, কথামুখ/মঙ্গলাচরণ, তরঙ্গ ইত্যাদিতে বিভাজনের মাধ্যমে *কথাসরিৎসাগরে*র বিশালত্বকে ধারণ করেন। সংস্কৃত শব্দ 'কথাসরিৎসাগর'-এর অর্থ গল্পনদীর মহাসমুদ্র। এ প্রসঙ্গে সেলিম আল দীন বলেন :

> চাকাকে কেউ যদি কাব্য বলেন আপত্তি করব না, গল্প বললে অখুশী হব না। আমি সব সময় চেয়েছি আমার লেখা নাটকগুলো নাটকের বন্ধন ভেঙে অন্যসব শিল্পতীর্থগামী হোক। কারণ শিল্পে আমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। তবুও সংস্কৃত 'কথাসরিৎসাগর' এর রীতিটাকে ধ্রুপদী জ্ঞানে এর গল্পবিভাজনরীতি মেনে চলেছি। কথাসরিৎসাগরের কথামুখ বা কথাপীঠ এবং লম্বক ও তরঙ্গ বিভাগ চাকাতে মেনে চলেছি। এর লক্ষ্য আধুনিক কথানাট্যের একটি নৈয়ায়িক ভিত্তি গড়ে তোলা।[৩৯]

আবার *যৈবতী কন্যার মন* কথানাট্যের দুই খণ্ডে মৃত দুই নারীর ফিরে আসা ও জীবনকাহিনি বলার মাধ্যমে সময়গত কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। এই গল্প কথনের মাধ্যমে ইউরোপীয় ধারার সময় ও স্থানের ঐক্যকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। তবে এ নাটক থেকে পরবর্তী নাটকে লম্বক ও তরঙ্গ বিভাজন রক্ষা করা হয়নি।[৪০]

জাতীয় নাট্যাঙ্গিক নির্মাণের যৌক্তিকতা

বাংলা নাটকের উৎপত্তি সুপ্রাচীন। পাশাপাশি ভারত উপমহাদেশের রয়েছে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নাট্য ইতিহাস।[৪১] অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এবং ঊনবিংশ শতকের শুরুতে পাশ্চাত্য বিভিন্ন নাটক বিশেষ করে শেকসপিয়রের নাটকের বাংলা অনুবাদ হতে থাকে। রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র মৌলিক নাটক লিখলেও পাশ্চাত্য নাটকের আঙ্গিক থেকে সরে আসেননি। এই ধারা এখনও বহমান আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে প্রতীয়মান হয়।[৪২]

> কিন্ত সহস্র বছর ধরে গড়ে ওঠা আমাদের শিল্প সৌন্দর্য বিচাররীতির ক্ষেত্রে উনিশ শতক থেকে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের প্রভাব হয়ে উঠে নিরঙ্কুশ। ক্রমে কুড়ি শতকে পাশ্চাত্যপ্রভাব অপ্রতিরোধ্য বলেই স্বীকৃত ও চর্চিত হয়ে আসছে। এর ফলে সহস্র বছরের শিল্পকর্মের যে দেশজ ধারাবাহিকতা আমরা দেখি তার বিচারের ক্ষেত্রে একটি অনপনেয় সঙ্কটের সৃষ্টি হল। সহস্র বছর ধরে যে সব রচনা আমাদের জাতির চিত্তজয়ী বলে কালজয়ী হয়ে উঠেছিল–এ্যারিস্টটল–হোরেস–লনজাইনাসের নন্দনতত্ত্বের বিচারে সেগুলো অকিঞ্চিৎকর ঠেকে।[৪৩]

ফলে বাংলা নাটকের জন্য একটি জাতীয় আঙ্গিক নির্মাণের প্রস্তাব যৌক্তিক হয়ে পড়ে। 'বার্ণনাত্মক নাট্য আঙ্গিকই বর্ণনাত্মক অভিনয়ের প্রধান উৎস।'[৪৪] এ প্রসঙ্গে সেলিম আল দীনের বক্তব্য স্পষ্ট :

> প্রায় এক যুগ ধরে ঢাকা থিয়েটার বর্ণনাত্মক নাট্য আঙ্গিক ও অভিনয় বিষয়ে যা করেছে বা বলে আসছে তার সঙ্গে এ দেশের লোক নাটকের অভিনয়ের রীতিকে মিলিয়ে শুধুমাত্র পাশ্চাত্যমুখী নয় এমন একটা প্রাকৃত–দেশজ অথচ সমকালীন এবং আধুনিক অভিনয় রীতির সূত্র-সংজ্ঞা তৈরি করা যেতে পারে।[৪৫]

বাঙালির হাজার বছরের নিজস্ব নাটক ও উপস্থাপন রীতি থাকার পরেও ইউরোপীয় নাটক দ্বারা প্রভাবিত হতে হতে আমাদের নাটক হয়ে পড়েছে শেকড়হীন। স্বাধীনতার পরে নাটক নিয়ে আশার সঞ্চার হলেও বাংলার সহস্র বছরের নাটক যেমন সামনে নিয়ে আসতে পারা যায়নি, পাশাপাশি নাটক উপস্থাপনের রীতিগুলোর মধ্যে সমৃদ্ধ বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির ভিতর দিয়ে নাটকের ধারাবাহিকতাকে ধরেও রাখা যায়নি। জাতীয় নাট্যাঙ্গিক কেমন হবে–তা নাট্যবোদ্ধাগণ ঠিক করতে পারেন। তবে এখানে বলে রাখা সমীচীন যে, জাতীয় নাট্যাঙ্গিক শিল্পে গ্রহণ ও বর্জনের পথটি যেন রুদ্ধ করে না দেয়। আবার কঠোরভাবে আঙ্গিক মেনে নাটক লেখা ও মঞ্চে উপস্থাপনার কাজগুলো করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টিশীলতার পথে প্রতিবন্ধকতা কি না, তা ভেবে দেখাও জরুরি। মাটির ঘ্রাণ থেকে উঠে আসা নাটকগুলোকে সামনে নিয়ে আবার নতুন করে শুরু করা যায়, সেই আঙ্গিকগুলোর সংশ্লেষে নতুন এক আঙ্গিক দাঁড় করানো যায়।

কিত্তনখোলা থেকে সেলিম আল দীনের নিজস্ব নাট্যভাবনা স্পষ্ট রূপ পেতে শুরু করে। তিনি গ্রামীণ জীবনের সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট, নীচতা ও ক্রূরতা, প্রেম ও বিচ্ছেদ রূপায়িত করেন বাঙালি নাট্যাঙ্গিকের অনুসরণে, কবিতা গান নাচ ও সংলাপের সমন্বয়ে।[৪৬] সত্তরের দশকের শেষের দিকেই সেলিম আল দীন সচেতনভাবে এ বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি *কিত্তনখোলা* নাটকের গঠনপদ্ধতিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পূজাউৎসবকেন্দ্রিক অলিখিত বাংলা নাটকের সম্ভাব্য আঙ্গিকরীতি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন।[৪৭] এ বিষয়ে সেলিম আল দীন বলেন :

> 'মুনতাসীর'–এই নামের গীতিরঙ্গ নাটকটির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃশ্যপট সৃষ্টির ব্যাপারটি একটি মাত্র মঞ্চদৃশ্যে সাধারণীকৃত হয়েছিল। পরের নাটকটি ছিল শকুন্তলা। তাতে আমরা 'নাটক' কথাটির পরিবর্তে ব্যবহার করেছিলাম 'দৃশ্যকাব্য'। 'রাস্তা নাচাও' আন্দোলনের নাটক 'চর কাঁকড়ায়' সচেতনভাবে বর্ণনাত্মক ভঙ্গির প্রয়োগ করি।[৪৮]

শুরুর দিকে সংলাপভিত্তিক পাশ্চাত্য আঙ্গিকের স্যাটায়ারধর্মী নাটক রচনা করলেও তিনি ক্রমাগত মাটিবর্তী বিষয় ও নাট্যাঙ্গিক নিয়ে গবেষণা অব্যাহত রাখেন এবং *চাকা* নাটক থেকে বর্ণনাত্মক নাট্যাঙ্গিক নির্মাণের জন্য প্রাচীন বাংলার নাট্য ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। শিল্পের এ ধারাটি বর্তমানে শিল্পে প্রচলিত অন্যান্য আঙ্গিকসমূহ বিলুপ্ত করে একটি শিল্পাঙ্গিক তৈরি করে। শিল্পের এই বিশেষ ফর্মকে একটি শিল্পদর্শনে ফেলতে চান সেলিম এবং তার নাম দেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পদর্শন। যে বর্ণনাত্মক নাট্যাঙ্গিক নির্মাণে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, যাকে তিনি কথানাট্য বলে অভিহিত করেন, তা যথাযথভাবেই দ্বৈতাদ্বৈতবাদকে ধারণ করে। আশির দশকের শেষের দিকে *চাকা* নাটক দিয়ে শুরু করে *যৈবতী কন্যান মন*, *হরগজ* এবং *স্বর্ণবোয়াল* কথানাট্যের মাধ্যমে আখ্যান বর্ণনার ধারায় নাট্যক্রিয়া এগিয়ে নেন সেলিম আল দীন। এ-সকল কাজের মাধ্যমে তিনি বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি অথবা কথানাট্যকে জাতীয় নাট্যাঙ্গিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।

উপসংহার

প্রাচীনকাল থেকে বাংলা নাটক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের ও শিল্পদর্শনের সংস্পর্শে এসেছে এবং সেইসব শিল্পমাধ্যম ও দর্শন দ্বারা এ অঞ্চলের নাট্যকারগণ প্রভাবিত হয়েছেন। তারা সেই দর্শন এবং আঙ্গিকে নাটক রচনার চেষ্টা করেছেন। ফলে আবহমান বাংলার সমৃদ্ধ নাট্যধারা বা নাট্যাঙ্গিকগুলো খুব স্বাভাবিক গতিতে সামনে এগুতে পারেনি। বিভিন্ন সময়ে বাংলা নাটক অন্য সংস্কৃতির নাট্য-দর্শন, আঙ্গিক এবং কোনো কোনো সময় বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হলেও অনেক পণ্ডিত মনে করেন এই প্রভাব বাংলা নাটকের সমৃদ্ধিকে বরং বেগবান করেছে। বাংলার সাধারণ মানুষের দ্বারা তৈরি হওয়া বাংলা নাটকের সুপ্রাচীন উৎসকে ছেঁটে ফেলে পাশ্চাত্য নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মেকি ও প্রাণহীন সংলাপ প্রক্ষেপণ-সর্বস্ব নাটক নির্মাণের সমারোহ বেশি দেখা যায়। সেলিম আল দীন সেই প্রক্রিয়ার বিপরীতে কথা বলেছেন। তিনি শক্তভাবে বলার চেষ্টা করেছেন, বাংলা নাটকের উৎপত্তি বাংলার জানপদ নাট্যক্রিয়া, পৌরাণিক ও লোককাহিনির মধ্য দিয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। যে সকল আঙ্গিকের ভিতর দিয়ে সহস্র বৎসর পূর্বে বা মধ্যযুগে পুরাণ নির্ভর কাহিনি, সাধারণ মানুষের মধ্যে জন্ম নেওয়া কাহিনি, মঙ্গলকাব্য, কীর্তন ইত্যাদি বাংলা নাটকের ঐতিহ্যকে ধারণ করে এসেছে কথানাট্য এ-সকল আঙ্গিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সময়ে এসে বাংলা নাটককে ঐতিহ্যমুখী করার অভিপ্রায়ে বাংলা নাটকের জন্য একটি নিজস্ব আঙ্গিক নির্মাণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন সেলিম আল দীন। পাশ্চাত্য প্রভাবজাত বর্তমান নাট্যচর্চা আমাদের নাটককে ক্রমাগত দূরে ঠেলে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যা অতীত ঐতিহ্য হারিয়ে হয়ে পড়েছে শেকড়হীন। তাই একটি জাতীয় নাট্যাঙ্গিক থাকার যৌক্তিকতা আছে। জাতীয় নাট্যাঙ্গিক নাটকে অন্য সকল মত ও পথ, নাট্যভাবনা, নাট্যরীতি, দর্শন ইত্যাদিকে সঙ্গে নিয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. সেলিম আল দীন, *চাকা* (ঢাকা : গ্রন্থিক, ১৯৯১), পৃ. ৪৩

২. কবীর চৌধুরী, *প্রসঙ্গ নাটক* (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮১), পৃ. ১৭০

৩. তদেব, পৃ. ১৭১

৪. মামুনুর রশীদ, *লেবেদেফ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ৯

৫. আসকার ইবনে শাইখ, *বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি* (ঢাকা : সাতরং প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ. ১৭

৬. ড. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস* (কোলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ১৯-২০

৭. সৈয়দ জামিল আহমেদ, "নাটক ও নাট্যকলা", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০), পৃ. ৩৭৫

৮. সেলিম আল দীন, *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৪*, সাইমন জাকারিয়া (সম্পাদিত), (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯), পৃ. ৩১৯

৯. অরুন সেন, *সেলিম আল দীন নাট্যকারের স্বদেশ ও সমগ্র* (বগুড়া : দুই বাংলার থিয়েটার প্রকাশন, ২০০০), পৃ. ১৯

১০. সেলিম আল দীন, *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

১১. সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা* (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৫), পৃ. ৯

১২. তদেব, পৃ. ১০

১৩. তদেব।

১৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* (কোলকাতা : এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০), পৃ. ৮-৯

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "রঙ্গমঞ্চ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা : ঐতিহ্য, ২০০৪), পৃ. ৭৪৮

১৬. অনন্ত মাহফুজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

১৭. সেলিম আল দীন, *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১৮. 'গৌড়জন' কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত অভিভাষণ, ১৮ আগস্ট ২০০২

১৯. "সেলিম আল দীন : এক সব্যসাচী নাট্য ব্যক্তিত্ব", সাক্ষাৎকার, সোহেল হাসান গালিব ও নওশাদ জামিল (সম্পাদিত), *কহন কথা* (ঢাকা : শুদ্ধস্বর, ২০০৮), পৃ. ৭৬

২০. সেলিম আল দীন, *স্বর্ণবোয়াল* (ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০০৭), পৃ. ৭

২১. তদেব, পৃ. ৯

২২. সেলিম আল দীন, *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৬*, সাইমন জাকারিয়া (সম্পাদিত), (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১), পৃ. ৫৪৯

২৩. তদেব, পৃ. ৫৫৩

২৪. তদেব

২৫. অরুণ সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

২৬. সেলিম আল দীন, *চাকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

২৭. তদেব, পৃ. ৫

২৮. অরুণ সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

২৯. সেলিম আল দীন, *চাকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৩০. সেলিম আল দীন, *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

৩১. অরুণ সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৩২. সেলিম আল দীন, *চাকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪, ১৬

৩৩. তদেব, পৃ. ৪৫

৩৪. তদেব, পৃ. ৪৪

৩৫. সেলিম আল দীন, *তিনটি মঞ্চনাটক* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬), প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

৩৬. কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর, "সেলিমের মঞ্চনাটক", *থিয়েটারওয়ালা*, দশম বর্ষ, ১-২ যৌথ সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন'০৮, পৃ. ৯২

৩৭. সেলিম আল দীন, *চাকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৩৮. *কথাসরিৎসাগর* অনন্তরাজার রাজত্বকালে, ১০৭০ খ্রিষ্টাব্দে বামভট্টের পুত্র কাশ্মীরি কবি সোমদেব ভট্ট কর্তৃক রচিত হয়েছিল। অনন্ত-রাজমহিষী বিদূষী সূর্যবতীর অনুপ্রেরণায় সোমভট্ট এ গ্রন্থ রচনা করেন। দাবি করা হয়, *কথাসরিৎসাগর* গ্রন্থটি মূলত দক্ষিণ ভারতের পৈশাচী উপভাষায় রচিত গুণাঢ্যের *বৃহৎকথা* অবলম্বনে রচিত। সংস্কৃতে 'কথাসরিৎসাগর' শব্দটির অর্থ গল্পনদীর মহাসমুদ্র। ১২৪টি অধ্যায়বিশিষ্ট মোট ১৮টি গ্রন্থে বিভক্ত *কথাসরিৎসাগর*-এ গদ্যাংশ ছাড়াও রয়েছে ২১ হাজারেরও বেশি শ্লোক। গ্রন্থের কেন্দ্রীয় কাহিনিটি হলো কিংবদন্তি রাজা উদয়নের পুত্র নরবাহনদত্তের

অভিযানের গল্প। এই কেন্দ্রীয় কাহিনিটির সঙ্গে বহুসংখ্যক উপকাহিনি যুক্ত করে রচনা করা হয় ভারতের বৃহত্তম কথাসংগ্রহ *কথাসরিৎসাগর*। গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন শ্রী হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস। অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, কোলকাতা কর্তৃক গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭ সালে।

৩৯. সেলিম আল দীন, *চাকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৪০. সেলিম আল দীন, *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

৪১. ইসমাইল মোহাম্মদ, *নাট্যকলার ক্রমবিকাশ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭), পৃ. ১

৪২. কবীর চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

৪৩. সেলিম আল দীন, *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

৪৪. তদেব, পৃ. ৩১৫

৪৫. তদেব, পৃ. ৩১৬

৪৬. অরুণ সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৪৭. সেলিম আল দীন, *তিনটি মঞ্চনাটক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৪৮. তদেব, পৃ. ২২৭